

**Semester – IV-(PG)**  
**Paper-403**

**Industrialization and Germany (1830-1870)**

ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপে যে দেশগুলিতে পরে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল তাঁর মধ্যে অন্যতম হল জার্মানী। জার্মানীর শিল্প বিপ্লবের চরিত্র ছিল ভিন্ন। ব্রিটেনের অনুকরণে নয়। তবে জার্মানীতে শিল্প বিপ্লব বিলম্বে হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় (ফ্রান্স ও রাশিয়া) এর গতি ছিল সচল ও দ্রুত। এর পশ্চাতে কার্যকর ছিল উনিশ শতকের জার্মানীর ভাবনা। প্রশাসনিক ঐক্যবদ্ধতা, শুল্ক নীতির সমতা বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি জার্মানীর শিল্প বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তবে জার্মানীর শিল্প বিপ্লবের আবহ তৈরি হয় নেপোলিয়ান বোনাপার্টের প্রাশিয়া জয়ের (১৮০৬) সময় থেকে। এই শিল্প বিপ্লবের সময়কাল (Take off এর সময়কাল) নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে বিস্তর। তৎসত্ত্বেও ১৮৩০-১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে জার্মানীর শিল্পায়নের ‘উড়ান পর্ব’ বলে অনেকে মনে করেন। উনিশ শতকে জার্মানী কতখানি শিল্প রাষ্ট্র হিসাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল বা জোলভেরিন বা রেলপথের বিস্তার জার্মানীকে কতখানি শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর আক্রমণ যেমন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো তেমনি অন্যদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। নেপোলিয়ান উত্তর পর্বে জার্মানী বিভক্ত ছিল মাত্র ৩৯টি রাজ্যে। এই রাজ্যগুলি ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। রাজ্যগুলি প্রশাসনিক স্বাধীনতার সঙ্গে মুদ্রাব্যবস্থা, উৎপাদন ও শুল্ক ব্যবস্থাতেও স্বাধীনতা ভোগ করত। জার্মানীর এই অনৈক্য শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছিলো। আবার অনাবাদী জমি, খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারে ব্যর্থতা ও বন্দরগুলিতে বিদেশীদের আধিপত্য জার্মানীর শিল্পায়নে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। সাবেকী কৃষিপদ্ধতি ও ভূমিদাস ব্যবস্থাও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সামরিক ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত খাজনা ভূস্বামীদের কোষাগার সমৃদ্ধ করলেও জার্মানীর শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না।

প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সীমানার সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া ও জার্মানীর অর্থনৈতিক ভাবনাও বদলাতে থাকে। প্রাশিয়ার পশ্চিম ও পূর্বদিকে নতুন নতুন রাজ্যের সংযুক্তিকরণের ফলে প্রশাসনিক সীমানা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সীমানার বৃদ্ধির ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপর অর্থনৈতিক বা শুল্ক সমতা আনার তাগিদ দেখা দেয়। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার পশ্চাতে যে কার্যকারণগুলি ছিল সেগুলি হল –

১. জার্মান রাষ্ট্রসংঘে অস্ট্রিয়ার প্রভাব খর্ব করা। ২. জার্মান রাজনীতিতে প্রাশিয়ার আধিপত্য বৃদ্ধি করা ৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাশিয়া ও জার্মানীকে এক শিল্পম্রোত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রাশিয়ার অভ্যন্তরে শুল্ক মুক্ত করার জন্য তাঁর নিজের রাজ্যগুলিকে নিয়ে গড়ে তোলে শুল্ক সংঘ (১৮১৮)। পরবর্তীকালে জার্মানীর স্বাধীন রাজারা এই শুল্ক সংঘে যোগদান করলে এক বৃহৎ সংঘে পরিণত হয়। ১৮৩৪ সালে তৈরি হয় জার্মান সংঘ। সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপর প্রয়োগ করা হয় একটাই শুল্ক নীতি। স্বাক্ষরিত হয় ‘জোলভেরিন’ চুক্তি। এই চুক্তির ফলে জার্মানী “All Germany became one fiscal and commercial unit” এ পরিণত হয়।

ভৌগোলিক দিক থেকে শুল্ক সংঘের সীমানা প্রায় ১০৬০ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে অবস্থিত। এবং প্রায় সাড়ে তেইশ হাজার মিলিয়ন মানুষ এই শুল্ক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। জোলভেরিন ব্যবস্থার ফলে সদস্য রাষ্ট্ররা কতখানি লাভবান হয়েছিল তা অনুমান করা যায় তা নিম্নের পরিসংখ্যানে দ্বারা স্পষ্ট হয় –

সাল	রাজস্ব আয়
১৮৩৪	১৪,৫০০,০০০
১৮৪৫	২৭,৪০০,০০০

১৮৪২ সাল পর্যন্ত এই শুল্ক সংঘকে নবীকরণ করা হয়। জোলভেরিন ব্যবস্থার সাফল্য ও উদ্যমকে প্রত্যক্ষ করে ক্ল্যাপহাম বলেন – “immeasurably the wisest and most scientific tariff then existing among the great powers”.

জার্মানীর ইতিহাসে জোলভেরিন ব্যবস্থা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। জার্মানী নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কৃত্রিম শুল্ক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে। জার্মানীতে শিল্পায়নের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এই শিল্পায়নকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এর প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা হয় রেলব্যবস্থা। ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশক ছিল জার্মানীর অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সময়কাল। ১৮৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী তে চালু হয় নতুন শুল্ক ব্যবস্থা। আর রেলপথ চালু হয় ১৮৩৫ এর ডিসেম্বর মাসে। সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রে রেলপথের সম্প্রসারণের জন্য একটি জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতি কার্যকর হয় দ্রুত। ১৯৫০ সালের মধ্যে ৫৪৫৬ কিমি রেলপথ চালু করা হয়। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের স্থাপিত হয় মাত্র ২৭৭৪ কিমি পথ। বাগিজের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পথ ড্রেসডেন ও লিপজিগের মধ্যে ট্রেন চালু [১৮৩৯] হওয়া আর রুচ অঞ্চলে রেলপথের প্রসার [১৮৪৭] জার্মানীর শিল্প বিপ্লবকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। রেলকে কেন্দ্র করে প্রযুক্তির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। জার্মানীতে খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারের সুযোগ বেড়ে যায়। খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সহজ হলে শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসে ব্যাংক অব প্রাশিয়া বা বার্লিন কমার্শিয়াল ব্যাংক-এর মত প্রতিষ্ঠান। রেল শিল্পকে কেন্দ্র করে লৌহ ও কয়লা শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে। একদিকে জোলভেরিনের ফলে বিরাট বাজার তৈরি হয়, অন্যদিকে এই চাহিদা মেটানোর জন্য জার্মানীতে শিল্প গড়ে ওঠা আবশ্যিক ছিল। এখানে রেল হয়ে উঠেছিল জার্মানী শিল্প বিপ্লবের ‘Leading Sector’। তাই জোলভেরিন শুল্ক বাধাকে দূর করেছিল আর রেল প্রাকৃতিক বাধাকে দূর করার ফলে জার্মান অর্থনীতির উন্নতি এসেছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিক থম্পসন।